Written by ফরিদে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

বিগত একশত বছরের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি হলো বিশ্বের দুটি বিশ্বশক্তির মাঝে একটির পরাজয় এবং বিলুপ্তি। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় রেকর্ড। এবং সে ইতিহাস নির্মিত হয়েছিল আফগানদের হাতে। বিলুপ্ত সে বিশ্বশক্তিটি হলো সোভিয়েত রাশিয়া। আফগান মোজাহিদগণ দীর্ঘ ১০ বছরের যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার এতটাই অর্থনৈতিক রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছিল যে দেশটির পক্ষে তার বিশাল দেহ নিয়ে টিকে থাকাই সম্ভব হয়নি। সেদিন জিতেছিল আফগান মোজাহিদরা। সেটিও অন্য কোন দেশের সাথে কোয়ালিশন করে নয়। সে বিজয়ের ফলে ডজন খানেক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। অথচ সোভিয়েত রাশিয়া চীনের মত জনসংখ্যায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশটিকে আদর্শিক দখলে নিয়েছিল। দখলে নিয়েছিল ইউরোপের অর্ধেক রাষ্ট্রকে।

এর পূর্বের শতাব্দিতে তথা উনবিংশ শতাব্দিতেও তারা আরেকটি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিল। সেটি হলো, সে সময়ের বিশ্বের একমাত্র বিশ্বশক্তি গ্রেট বৃটেনকে শোচনীয় ভাবে দুই বার পরাজিত করেছিল। একবার তো হামলাকারি বৃটিশ সেনাদলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল মাত্র কয়েকজন। তখন তাদের জনসংখ্যা আজকের বাংলাদেশের একটি জিলোর সমানও ছিল না। অথচ তাদের চেয়ে ৬০ গুণেরও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশ ১৯০ বছর বৃটিশের গোলামী করেছে। আফগান মোজাহিদগণ এবার বিজয়ে হ্যাট্রিক করতে যাচ্ছে। বিশ্ব-শক্তির উপর এটি হবে তাদের তৃতীয় বিজয়। তারা পরাজিত করতে যাচ্ছে শুধু মার্কিন বাহিনীকে নয়, ন্যাটোর সম্মিলিত বাহিনীকে। একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি হবে আরেক নয়া রেকর্ড। পরাজয়ের সে ঘন্টা বেজে উঠছে পাশ্চাত্যের মিডিয়াতে। বৃটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রখ্যাত কলামিষ্ট সাইমন জেনকিন্স সেটি স্পষ্ট করে লিখেছেন গত ২০ই আগষ্টের সংখ্যায়। তার মতে, আফগানিস্তান ন্যাটোর কোন ভবিষ্যৎ নেই। তারা যে পরাজিত হচ্ছে তা নিয়ে আর সামান্যতম সন্দেহও নেই। তার কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কোথাও আরেক ভিয়েতনামের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় সেটি আফগানিস্তান। সমগ্র বিশ্বের লড়াকু জিহাদীদের জন্য বড় কাঙ্খিত স্থানটি এখন আর ইরাক নয়, সেটি আফগানিস্তান। ন্যাটোর পরাজয়ের সে সুর ধ্বনিত হয়েছে বৃটেনের ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার প্রখ্যাত কলামিস্ট রবার্ট ফিস্কের লেখাতেও। ২০০১ সালের অক্টোবরে মার্কিন বাহিনী দেশটিকে দখলে নিলেও শুরুতেই তারা বুঝতে পারে দেশটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশটি নিয়ন্ত্রণের দায়ভার চাপায় ন্যাটোর উপর। ফলে হাজির করে প্রায় ৪০টি দেশের বহুজাতিক ৭০ হাজার সৈন্যকে। এখন দাবী উঠছে, আরো সৈন্য চাই। বাড়তি সৈন্যের সংখ্যা বিজয়ের সম্ভাবনা কি আদৌ বাড়াবে? পুকুরে মাছের সংখ্যা বাড়লে যেমন শিকারীর মৎস্য শিকারে সুবিধা হয় তেমনি সুবিধা হবে তালেবানদের। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা মি. ব্রেজেনিস্কি বলেছেন, আফগানিস্তানে সৈন্য বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এতে আফগানদের ক্রোধ বাড়বে।

হতাশা ফুটে উঠছে এমনকি আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর কমান্ডারের সাম্প্রতিক বক্তব্যেও। তিনি বলেছেন, মোজাহিদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস ও পাক-আফগান সীমান্ত দিয়ে তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে না পারলে বিজয় অসম্ভব। মোজাহিদদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র বলতে তিনি বুঝিয়েছেন পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে। কিন্তু সেটি কি সম্ভব? সেটি সম্ভব নয় বলেই নিশ্চিত বলা যায়, আফগানিস্তানে তাদের বিজয়ও অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ সীমান্তে বিশাল উঁচু দেওয়াল ও বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দিয়েও প্রতিবেশী মেক্সিকো থেকে বেআইনী অনুপ্রবেশকারিদের প্রবেশ একদিনের জন্যও রুখতে পারেনি। যে মানুষ আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করতে পারে তারা কি একটি দেশের সীমান্তও অতিক্রম করতে পারে না? প্রতিবছর হাজার হাজার মেক্সিকান প্রবেশ করছে যুক্তরাষ্ট্রে। আর পাক-আফগান সীমান্ত সমভূমি নয়, সমূদ্র-ঘেরাও নয়, বরং দূর্গম পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্গলে ঘেরা। ফলে এ সীমান্ত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। বহু হাজার মাইল বিস্তৃত পাহাড়

Written by ফরিদে জে মাহব্ুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

পর্বতরে কে ান কে ানো দয়িে কে কভিাবে প্রবশে করছে সটো কিয়কে লক্ষ সীমান্ত প্রহরী দয়িওে কি রুখা সম্ভব? সটো দখলদার রুশ বাহনিী পারনে। ভারত শাসনকালে ব্রটিশিরাও পারনে। ন্যাটে া বাহনিীও পারছে না। অথচ ন্যাটে া সে পাহারাদারি দায়তি্ব চাপাচ্ছে পাকসি্তানরে উপর। পাকসি্তানরে সে অর্থবল, লে াকেবল, মনবল - কে ানটাই নইে। ভারতরে সাথে তার নজিরে সীমান্ত পাহারা দতিইে পাকসি্তান হমিশমি খাচ্ছে। সম্প্রতি কাশ্মীর অশান্ত হওয়ায় তার দুশ্চনি্তা আরে া বড়েছে। ফলে তারা কনে নজি খরচে আফগান সীমান্ত পাহারা দবি? এটতি ে া আফগান সরকার ও মার্কনীদরে কাজ। মার্কনীদরে চাপে তাদরে অনুগত বন্ধু জনোরলে মে াশাররফ তবু ও বহু চষে্টা করছে, কনি্তু পারনে। অথচ মে াশররফরে সে ব্যর্থতা মার্কনি প্রশাসন মনেে নতিে পারনে, বলছে মে াশাররফ একাজে আন্তরকি ছলি না। এখন তালবোনদরে শক্তবিৃদ্ধরি জন্য দে াষ চাপয়িছে পাকসি্তানরে সরকার ও তাদরে গে ায়নে্দা সংগঠন আইএসআইয়রে উপর। শষেদকিে বুশ প্রশাসনরে ক্ষে াভ এতটাই বড়েছেলি যে মে াশাররফরে অপসারণওে সায় দয়িছে। পাকসি্তানরে অভ্যন্তরে নজিরোই বহুবার বে ামা বর্ষণ করছে এবং বহু নরিপরাধ নরিীহ মানুষকে তালবোন বলে হত্যা করছে। আর এভাবে পাকসি্তানরে রাজনীতকিে আরে া অস্থতিশিীল করছে। পাকসি্তানরে অভ্যন্তরে মার্কনি বে ামা বর্ষণে পাকসি্তানরে সার্বভে ামত্ব যভোবে লংঘতি হলে া সটো পাকসি্তানরে যে কে ান সরকাররে পক্ষে মনেে নওেয়া অসম্ভব। এতে পাকসি্তান সরকাররে পক্ষে অত্যন্ত কঠনি হয়ছে মার্কনীদরে পক্ষ নওেয়া। এতে তালবোন বাহনিীর রকি্রটুমনে্ট ও সমর্থণ বড়েছে প্রচন্ড ভাবে, এবং সটো বিুঝা যাচ্ছে আফগানসি্তান ও পাকসি্তানরে রণক্ষত্রে। তালবোনরা যে শুধু আফগানসি্তানরে ৭০% দখলে নয়িছে তাই নয়, পাকসি্তানরেও সীমান্ত প্রদশে ও বলেুচসি্তানরে বশিাল পাহাড়ী এলাকাও নজি দখলে নয়িছে। পাকসি্তানরে পুলশি বা প্রশাসনরে কর্মকর্তাদরে প্রবশে সখোনে অসম্ভব। পাকসি্তান সনোবাহনিীকওে যতেে হয় হলেকিপ্টার গানশপি ও ভারী কামান নয়ি। সটোও কয়কে দনিরে দখল জময়িে রাখার জন্য।

ন্যাটে ার ব্যর্থতা প্রকট ভাবে প্রকাশ পয়েছে চলতি সপ্তাহে। দশেরে গ্রামীন এলাকা যে হাতছাড়া হয়ে গছে তা নয়িে এমনকি বিুশ-ব্রাউন-সারকে াযী চক্ররেও দ্বমিত নইে। এমনকি ঔপনবিশেকি চতেনার ধারক ব্রটিনেরে ডইেলী টলেগি্রাফও তা নয়িে দ্বমিত করনেো। তবে তাদরে বশি্বাস ছলি, সমগ্র আফগানসি্তানরে উপর নয়িন্ত্রণ না থাকলওে অন্ততঃ কাবুল ও তার আশপোশরে এলাকার উপর ন্যাটে া নরিাপত্তা প্রতষি্ঠা করতে পরেছে। এ সপ্তাহে প্রমাণ হল, কাবুলরে অতি কাছওে তারা কতটা নরিাপত্তাহীন। পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম ছবছিাপছে, মে াটর সাইকলে, খে ালা জপি চপেে মে াজােহদিগণ কভিাবে কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়ে - যা পাকসি্তানে সীমান্তরে দকিে যাওয়ার প্রধান সড়ক - তার আশপোশে প্রকাশ্যে চলাফরো কর। গত ১৭/০৮/০৮ তারখি কাবুল থকেে সামান্য দূরে ফ্রান্সরে ১০ জন সনৈকিকে তারা হত্যা করছে এবং মারাত্মক ভাবে আহত করছে ২১ জনক। পরদকিে পাকসি্তান সীমান্ত থকেে মাত্র ২০ মাইল দূরে বশিাল মার্কনি ঘাংটকি খাম্প সালমেে ার সম্মুখ ভাগে হামলা হয়ছে। নহিত হয়ছে ১৩ জন যারা মার্কনীদরে জন্য করতে া, আহত হয়ছে আরে া ২২ জন। গত ৭ই জুলাই বধি্বস্ত হয়ছে কাবুলরে ভারতীয় দূতাবাস। সে বে ামা হামলায় মারা যায় ৪১জন।

তবে যতই বাড়ছে প্রতরিে াধ ততই মারমুখী হচ্ছে ন্যাটে া বাহনিী। গত ২০/০৮/০৮ তারখিে মার্কনি বাহনিী হরিাত প্রদশেরে সনিদান্দ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি নাগরকিকে হত্যা করছে। নহিতদরে মধ্যে ১৯ জন মহলিা এবং ৫০ জন শশি্ু। আর এ তথ্য প্রকাশ করছে আফগানসি্তানরে স্বরাষ্ট্র দফতর। তবে আল-জাজরিা স্থানীয় ব্যক্তদিরে বরাত দয়িে খবর দয়িছে, এ হামলায় মারা গছে ১০০ জনরেও বশেী। এখন আর শুধু তদন্ত নয়, তারা দায়ী ব্যক্তদিরে শাস্তদিাবী করছ। এর ক'দনি আগে ১১ই আগষ্ট মার্কনি বমিান হামলায় নহিত হয়ছে ১২ জন বসোমরকি নাগরকি। একমাত্র গত ৮ মাসইে তারা ১ হাজাররে বশেী বসোমরকি ব্যক্তকিে হত্যা করছে। কথা হলে া, এমন হত্যা পাগল মার্কনীরা আফগানসি্তানকে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন উপহার দবি সটো কি কিউে বশি্বাস করবে? অন্ততঃ আফগানরা সটো আর বশি্বাস করে না বলইে এখন তারা তাদরে থকেইে তারা মুক্তি চায়। আফগানদরে কাছে জীবন বাংচানই এখন বড় ইস্যু হয়ে দাংড়য়িছে।

বলা হয়ে থাকে, নউিয়র্ক ও পনে্টাগণে ২০০১ সালরে ৯ই সপে্টম্বর যে হামলা হয়ছেলি আফগানসি্তানে মার্কনি হামলার পরকিল্পনা হয়ছেলি তারপর। কথাটি ঠকি নয়। পরকিল্পনা হয়ছেলি নব্বইয়রে দশকইে। একথা সত্য, সে াভয়িতে রাশয়িার

লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোজাহিদদের সাহায্য করেছিল। তবে সে সাহায্য নিঃশর্ত ছিল না। তাদের আশা ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার পরাজয়ের পর আফগানিস্তান তাদের অনুগত থাকবে। কিন্তু তালেবানদের ক্ষমতায় যাওয়ায় মার্কিনীদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। আর এ কারণে তাদের অপসারণও মার্কিনীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেটি নিউইয়র্কে হামলার বহু পূর্বেই। সেটি কোন গোপন বিষয়ও ছিল না। নিউজ উইক ও ওয়াশিংটন পোষ্টে তা নিয়ে একাধিক নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। ওয়াশিংটন পোষ্টের প্রথম পৃষ্টায় ছাপা হয়, সিআইএ সেখানে ১৯৯৭ সাল থেকে তালেবান সরকার উচ্ছেদের লক্ষ্যে কাজ করছিল। ২০০১ সানের ৩রা অক্টোবের ওয়াশিংটন পোষ্ট খবর ছাপে, ক্লিনটন প্রশাসন এবং প্যাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ১৯৯৯ সালেই বিন লাদেনকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। তার আগেই জেনারেল মোশাররফ নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করেন। জেনারেল মোশাররফ আর সে পরিকল্পনা নিয়ে এগুয়নি। ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত জেনেস ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও রাশিয়ার সহযোগিতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তালেবান সরকারের অপসারণের চেষ্টা করে। এ লক্ষ্য পূরণে যুক্তরাষ্ট্র তাজিকিস্তান ও উযবেকিস্তানে অবস্থিত তাদের ঘাঁটি থেকে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে বিপুল অস্ত্র জোগাতে থাকে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ২০০০ সালের ২রা নভেম্বর খবর দেয়, তালেবান সরকার হটানোর লক্ষ্যে সিআইএ বেছে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা রবার্ট ম্যাকফারলেনকে। তিনি তালিবান বিরোধী সাবেক মোজাহিদ নেতা আব্দুল হক ও আহম্মদ শাহ মাসুদকে বেছে নেন এবং সে পরিকল্পনা হয়েছিল টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার অনেক আগেই। কিন্তু মার্কিনীদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কারণ, এ দুইজনই নিহত হয় তালেবান সরকারের হাতে। আহমেদ শাহকে হত্যা করতে সাহায্য করেছিল একজন আলজেরিয়ান মোজাহিদ।

অন্যদের ঘাড়ে অস্ত্র রেখে উদ্দেশ্য সাধনই মার্কিনীদের প্রথম প্রায়োরিটি। লক্ষ্য, নিজেদের অর্থ ও রক্তক্ষয় কমানো। কিন্তু তালেবানদের বিরুদ্ধে সে কৌশল সফল হয়নি। ফলে নিজেদেরেই নামতে হয়েছে। এবং সেটির শুরু ২০০১ সালের ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগণ বিধ্বস্ত হওয়ার ১ মাস পর। শুরুতেই ঘোষণা দিয়েছিল, হামলার লক্ষ্য আল-কায়েদা নেতা বিন লাদেন ও তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের গ্রেফতার এবং আল কায়েদাকে ধ্বংস করা। কিন্তু বিগত প্রায় ৭ বছরে সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এখন তাদেরকে গ্রেফতার বা হত্যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বোমা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবিস্কারককে হত্যা করে লাভ হয় না। তবে ন্যাটো বাহিনী সফল হয়েছে কয়েক লক্ষ নিরপরাধ মানুষ হত্যায়। হাজার হাজার বোমা ফেলেছে বসত গৃহে, হাটবাজারে এমনকি বিবাহ মজলিসে। সমগ্র দেশে পরিণত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। ৭ বছর লাগাতর যুদ্ধের পরও ন্যাটো বাহিনী দেশটির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে পারেনি। বরং কমেছে অনেক। ২০০১ সালে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, ২০০৮ সালে তা নাই। শুধু বেড়েছে কবর, ধ্বংসস্তুপ ও পঙ্গু মানুষের সংখ্যা। কবরে কবরে ভরে উঠছে গোরস্থানগুলো। এগুলো পরিণত হয়েছে ন্যাটো-বর্বরতার প্রতীক। ৭ বছর আগে যে নিরাপত্তা পেত এখন সে নিরাপত্তার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন কি রাজধানী কাবুলেও নয়।

তালেবানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির কারণ জনসমর্থন। মাছ যেমন পানিতে ইচ্ছামত সাঁতার কাটে মোজাহিদরাও তেমনি জনসমর্থনের কারণে অস্ত্র কাঁধে রাস্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। ফলে তালেবান ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্র জনগণকে। আফগানিস্তানে যত মুসলিম দেশে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেতে হলে যে কোন লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামী হতে হয়। তখন সে যুদ্ধে সাধারণ মুসলমান শুধু মৌখিক সমর্থণই দেয় না; অর্থ, সময় এবং রক্তও দেয়। রুশদের বিরুদ্ধে সেটিই প্রমানিত হয়েছে। এখন আবার সেটিই দ্বিতীয়বার প্রমানিত হচ্ছে। ইসলামে নিছক যুদ্ধ বলে কোন প্রতিশব্দ নাই। যেটি আছে সেটি হলো জ্বিহাদ। মুসলমানের প্রতিটি কর্মকে যেমন হালাল হতে হয়, তেমনি প্রতিটি যুদ্ধকে জ্বিহাদ হতে হয়। সেক্যুলার বা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে প্রাণদান দূরে থাক সামান্য অর্থদানেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আগ্রহ থাকে না। এটি অপচয়। এমন যুদ্ধে যোগ দেয় নিছক পেশাদার বেতনভোগি ও ধর্মে অঙ্গীকারশূণ্য সেক্যুলারেরা। কিন্তু জ্বিহাদ সর্ব-মুসলমানের। ধর্মপ্রাণ মুসলমান তখন দিগ্বিদিক থেকে ছুটে আসে পঙ্গপালের মত। তারা যোগ দেয় নিজ-খরচে। রুশ-দখলদারী আমলে একই কারণে আফগানিস্তানের জ্বিহাদে মোজাহিদরা ছুটে এসেছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলি থেকে। আফগানিস্তানে আজও সেটিই হচ্ছে। কারণ মুসলিম বিশ্বে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা কম নয় যারা নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাতের পাশাপাশি ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত জ্বিহাদের বিশুদ্ধ ক্ষেত্রেও খুঁজে। এমন ক্ষেত্রে পেলে তারা নিজ উদ্যোগে উড়ে আসে। ভৌগলিক বাধা কোন বাধাই নয়। এজন্যই তালেবান

বাহিনীতে লড়াকু মোজাহিদের অভাব হচ্ছে না। রুশ বাহিনীর দখলদারির আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ন্যাটো বাহিনী সমস্যা হল তারা ইসলামের অতি মৌলিক বিষয়কেও বুঝতে ভুল করছে। একটি মুসলিম দেশে অমুসলিম দখলদারি এবং গণহত্যা যে জ্বিহাদের বিশুদ্ধ বৈধতা দেয় সে সামান্য জ্ঞান কি মার্কিনীদের আছে? এ অজ্ঞতার কারণে বুঝতেই পারে না, আফগানিস্তানের জ্বিহাদে কেন আরব, পাকিস্তানী, চেচেন, উজবেক বা উইগুর চাইনিজ মোজাহিদ লড়ছে। ভাবছে, সন্ত্রাসী বলে গালিগালাজ করলে বা গোয়ান্তানামো বে'র ভয় দেখালেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভুলে যায়, ৪০টির বেশী অমুসলিম দেশের ৭০ হাজার সৈন্য ন্যাটোর পতাকা তলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে আফগানিস্তানে। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের। এসেছে অন্য গোলার্ধ ও বিশ্বের অন্য কোণ থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভূগোল কোন বাধাই সৃষ্টি করছে না। এমন প্যান-পাশ্চাত্যবাদ হলো তাদের রাজনীতি, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি। এর রুটও গভীরে রয়েছে তাদের প্যান-খৃষ্টবাদে। অথচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্যান-পাশ্চাত্যবাদ, প্যান-খৃষ্টবাদ ও তার প্রতীক ন্যাটোর মোকাবেলায় আফগানিস্তানে যেটি প্রবল কাজ করছে সেটি হলো প্যান-ইসলামিজম। ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধে উঠে যে প্রতিরোধ লড়াই তারা লড়ছে সেটি তাদের নিছক রাজনীতি নয়, পররাষ্ট্রনীতি নয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটি সর্বোচ্চ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।

আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অর্থনৈতিক। মধ্য এশিয়ার তেল ও গ্যাসের খনিতে যাওয়ার জন্য তাদের রাস্তা দরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার নব্য আবিস্কৃত তেল ও গ্যাস খনির প্রায় ৭৫% এখন মার্কিনীদের হাতে। স্থলভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এ এলাকার তেল ও গ্যাস নিয়ে আসার জন্য আফগানিস্তানের উপর দিয়ে তারা তেল ও গ্যাসের পাইপ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তালেবানদের ক্ষমতায় থাকার কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি অন্যত্র। সোভিয়েত রাশিয়ার দখলদারি মুক্ত করতে গিয়ে সমগ্র আফগানিস্তান পরিণত হয়েছিল জ্বিহাদের ইনস্টিটিউশনে। সে ইনস্টিটিউশন পরিচর্যা দিচ্ছিল জ্বিহাদী চেতনার। ইসলামের বিপ্লবী আদর্শ যে কত শক্তিশালী সেটির প্রমাণ তারা ময়দানে দিচ্ছিল। ইসলামকে দ্রুত একটি আদর্শিক শক্তি হিসাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদিনা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের বুকে আর কোন দেশে এত মোজাহিদ ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কোন ভৌগলিক সীমারেখাও ছিল না। নানা ভাষাভাষি মানুষ এখানে এক মোহনায় এসে উপনিত হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চেচনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টার্গেট রূপে বেছে নিয়েছিল মার্কিন আধিপত্যবাদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তালেবানদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যের স্বার্থ ও মূল্যবোধের প্রতি এটিকে তারা হুমকি রূপে মনে করে। মুসলিম দেশগুলিতে ব্যভিচারে প্রাণদন্ড মিলবে, মদ্যপানে শাস্তি হবে, নিষিদ্ধ হবে নাচগান, উলঙ্গতা, বেআইনী হবে সূদী শোষণ ও কায়কারবার - এমনটি তাদের কাছে গ্রহনযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলোই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শিকড়। সাম্রাজ্যের বিস্তার না হোক, অন্ততঃ এগুলিকে তারা বিশ্বময় করতে চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব ছোট হয়ে যায়। তারা চায়, বিশ্বকে অভিন্ন মানচিত্রের আওতায় আনতে না পারলেও একটি অভিন্ন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আওতায় আনা। তাছাড়া তাদের বিচরণত বিশ্বময়। তারা যেখানে যায় মদ্যপান, ব্যভিচার, সূদখোরীর ন্যায় অভ্যাসগুলো সাথে নিয়েই যায়। বিশ্বের ৫৫টির বেশী মুসলিম দেশে সেগুলি নিষিদ্ধ হলে তাদের বাঁচাটাই নিরানন্দ হবে। প্যাশ্চত্য সংস্কৃতির এভাবে বিশ্বময় প্রচার করার প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করছিল তালেবানরা। শুধু আফগানিস্তানেই নয়, অন্যান্য মুসলিম দেশেও। তালেবানদের উচ্ছেদ এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কাছে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেটি গোপন বিষয়ও ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার বলছিলেন, এটি হলো দুটি মূল্যবোধের যুদ্ধ, এবং ন্যাটো লড়ছে সে মূল্যবোধের বিজয়ে। একই যুক্তিতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বারাক ওবামা বলছেন, পাশ্চাত্যের মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্রাউন বলছেন, আফগানিস্তান হলো আসল ফ্রন্টলাইন। একই মত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও জার্মান চ্যান্সেলরেরও। এভাবে এ যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একার যুদ্ধ থাকেনি। পরিণত হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য খৃষ্টান জগতের যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জায়েজ করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের মুখ দিয়ে একবার ক্রসেড শব্দটিও বেরিয়েছিল। তাই যুদ্ধের শুরুতে বিন লাদেনকে হত্যা করা প্রায়োরিটি বলে ঘোষণা করা হলেও আজ তার সেটি মুখে আনা হয় না। এখন সেটি শরিয়তি আইনের উচ্ছেদে, জ্বিহাদী ইসলামের বিনাশ। তালেবানদের অপরাধ শুধু এ নয় যে তারা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করছিল। এবং জিহাদকে বিশ্বময় করছিল।

এজন ্যই ন ্যাটে ার য ু দ ্ধ শ ু ধ ু সামরকি নয়; তাদের ্শকি এবং সাংস ্ক ৃতকি৷ ইসলামরে মে ৌলকি বশি ্বাসগ ু লে াকে মে ৌলবাদ বলে সগে ু লে ারেই বলি ু প ্ত চািয়৷ ফলে তারা শ ু ধ ু বে াোর ু বমিান, ট্যাংক ও গে াোলাবার ু দ নয়িইে সখোনে হাজরি হয়ন,ি হাজরি হয়ছে শেক ্তশিালী প ্রচার মাধ ্যম, স ্যকে ু লার মডলেরে স ্ক ু ল, মদ, অশ ্লীল ভারতীয় ও হলউিডরে ছায়াছব ি ও অসংখ ্য স ্যকে ু লার এনজওি নয়িওে৷ এনজওিগ ু লে া বাংলাদশেরে মহলিাদরে যমেন রাস ্তায় নামযি়েছে এবং লে ানে দওেয়ার নামে স ু দ খাওয়ার ন ্যায় অতি জঘন ্য হারাম কাজকে সংস ্ক ৃত িবানয়িে ফলেছে সটে ি তারা আফগানসি ্তানওে করতে চায়৷ ইসলাম এমনক িহজ্জ ্বরে ন ্যায় ফরয কাজওে মহলিাদরে একাকী যতেে দয়ে না৷ অথচ এনজওি গ ু লমিহলিাদরে একাকী গাছ পাহারায় নামযি়েছ,ে দে াকোনে বসযি়েছে৷ যে ম ু ল ্যবে াধেরে কারণে ঢাকা বা ম ু ম ্বাইয়ে পততিাব ৃত ্ত ি বা ব ্যাভচিার যমেন শাস ্তযি াে গ ্য অপরাধ নয় বরং আইনসদি ্ধ একট ি পশো, সটে ি তারা আফগানসি ্তানওে দখেতে চায়৷ আরে া দশটা পিণ ্যরে ন ্যায় নারী দহেকওে সহজে কনো-বচোর পণ ্যে পরণিত করতে চায়৷ তাদরে কাছে ব ্যাভচিারদিরে পাথর মরেে হত ্যার কে ারোআন িআইন অমানবকি৷ তালবোনদরে পরাজয়রে পর বজিয়ী শক ্তি তাই ঘে াষণা দয়িছেলি, আর যাই হে াক শরয়িতরে আইন তারা প ্রতষ্ঠি ্ঠতি করতে দবেে না৷ হামলার লক ্ষ ্য যে নছিক বনি লাদনে ও মে াল ্লা ওমররে হত ্যা নয় বরং ইসলামরে বধিান ও ম ূল ্যবে াধেরে নরি ্ম ূল সটেইি সদেনি প ্রকাশ পয়েছেলি৷ তাদরে কথা, ইসলামকে জহিাদম ু ক ্ত করতে হবে৷ কারণ, এ জহিাদী চতেনাই পাশ ্চাত ্যরে আধপিত ্য বসি ্তাররে পথে বড় বাধা৷ জহিাদী চতেনার শক ্তি তারা স ্বচক ্ষে দখেছেে রাশয়িার বরি ু দ ্ধ৷ দখেছেে লবোননে৷ যে ইসরাইলী সামরকি শক ্তরি বরি ু দ ্ধে মশির, সরিয়িা ও জর ্দানরে মলিতি বাহনী এক সপ ্তাহ টকিতে পারনেসি িইসরাইলী বাহনীকে তনি সপ ্তাহব ্যাপী র ু খছে হজিব ু ল ্লাহ৷ একই শক ্ত িবলে হামাস ইসরাইলীদরে বতিাড়তি করছে গাজা থকেে৷ এ জ ্বহিাদী চতেনা-সম ্পন ্ন ইসলামকে তারা বলে মে ৌলবাদ৷ ম ু সলমানরো কে ান ধরণরে অস ্ত ্র বানাবে বা ব ্যবহার করবে সটে যিমেন নরি ্ধারণ করতে চায় তমেন ি ইসলামরে কে ান শকি ্ষাকে গ ্রহন করবে বা বর ্জন করবে সটেওি তারা নরি ্ধারণ করে দতিে চায়৷ আফগানসি ্তানে ন ্যাটে ার য ু দ ্ধ কে ান জাতয়িতাবাদী শক ্তরি বরি ু দ ্ধে নয়, কে ান জাতীয় সরকাররে বরি ু দ ্ধওে নয়৷ বরং সটে িহলি ে া ইসলাম ও ইসলামি ম ূল ্যবে াধেরে বরি ু দ ্ধে৷ এখাইে তালবোনদরে বড় সাফল ্য৷ পএিলও সটে িপারনে৷ি কাশ ্মরীরীাও এ যাবত পারনে৷ি (অবশ ্য কাশ ্মরীরীা ইদানং িজাতয়িতাবাদ ছড়েে ইসলামরে দকিে আসছ৷ে তারা এখন শ ্লে াগান দচি ্ছে ‘আজাদীকা মতলব কয়িা? লা ইলাহা ইল ্লাল ্লাহ’) অথচ তালবোনরা এ য ু দ ্ধকে ইসলাম ও অনসৈলামরে য ু দ ্ধে পরণিত করছ৷ে পরণিত করছে স ্যকে ু লারজিম ও জাতয়িতাবাদম ু ক ্ত এক নরি ্ভজোল জ ্বহিাদে৷ এমন য ু দ ্ধে মহান আল ্লাহও তাদরে পক ্ষে হয়ে যান৷ নবীজী (সাঃ)র আমলওে এমনটওি হয়ছেলি৷ তালবোনদরে বশি ্বাস, আল ্লাহর সাহায ্য ও বজিয় তে া এ পথইে স ু নশি ্চতি হয়৷ কথা হলে া, ন ্যাটে ার বমিানগ ু লে া আফগানদরে অসংখ ্য বাড়ী-ঘর ও দে াকোনপাট গ ু ড়য়িে দতিে পারলওে এ বশি ্বাসকে তাক করে ক িএকটা গি েোলাও ছ ু ড়তে পরেছে?ে ২৩/০৮/০৮

আফগানসি ্তানে ন ্যাটে ার অত ্যাসন ্ন পরাজয়
 ফরি ে জে মাহব ু ব কামাল

বগিত একশত বছররে মানব ইতহিাসে সবচয়েে গ ু র ু ত ্বপ ূর ্ণ যে ঘটনাট িঘটিছে সটে িহলি ে া বশি ্বরে দ ু ট িবশি ্বশক ্তরি মাঝে একটরি পরাজয় এবং বলি ু প ্ত৷ি বংিশ শতাব ্দরি ইতহিাসে এটইি ছলি সবচয়েে বড় রকের ্ড৷ এবং সে ইতহিাস নরি ্মতি হয়ছেলি আফগানগানদরে হাতে৷ বলি ু প ্ত সে বশি ্বশক ্তটি িহলি ে া সে াভয়িতে রাশয়িা৷ আফগান মে াজোহদিগণ দীর ্ঘ ১০ বছররে য ু দ ্ধে সে াভয়িতে রাশয়িার এতটাই অর ্থনতৈকি রক ্তক ্ষরণ ঘটয়িছেলি যে দশেটরি পক ্ষে তার বশিাল দহে নয়িে টকিে থাকাই সম ্ভব হয়ন৷ি সদেনি জতিছেলি আফগান মে াজোহদিরা৷ সটেওি অন ্য কে ান দশেরে সাথে কে ায়লেশিন করে নয়৷ সে বজিয়রে ফলে ডজন

খানেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। অথচ সোভিয়েত রাশিয়া চীনের মত জনসংখ্যায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশটিকে আদর্শিক দখলে নিয়েছিল। দখলে নিয়েছিল ইউরোপের অর্ধেক রাষ্ট্রকে। এর পূর্বের শতাব্দিতে তথা উনবিংশ শতাব্দিতেও তারা আরেকটি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিল। সেটি হলো, সে সময়ের বিশ্বের একমাত্র বিশ্বশক্তি গ্রেট ব্রিটেনকে শোচনীয় ভাবে দুই বার পরাজিত করেছিল। একবার তো হামলাকারি ব্রিটিশ সেনাদলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল মাত্র কয়েকজন। তখন তাদের জনসংখ্যা আজকের বাংলাদেশের একটি জেলার সমানও ছিল না। অথচ তাদের চেয়ে ৬০ গুণেরও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশ ১৯০ বছর ব্রিটিশের গোলামী করেছে। আফগান মোজাহিদগণ এবার বিজয় হ্যাট্রিক করতে যাচ্ছে। বিশ্ব-শক্তির উপর এটি হবে তাদের তৃতীয় বিজয়। তারা পরাজিত করতে যাচ্ছে শুধু মার্কিন বাহিনীকে নয়, ন্যাটোর সম্মিলিত বাহিনীকে। একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি হবে আরেক নয়া রেকর্ড। পরাজয়ের সে ঘণ্টা বেজে উঠছে পাশ্চাত্যের মিডিয়াতে। ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রখ্যাত কলামিষ্ট সাইমন জেনকিন্স সেটি স্পষ্ট করে লিখেছেন গত ২০ই আগষ্টের সংখ্যায়। তার মতে, আফগানিস্তানে ন্যাটোর কোন ভবিষ্যৎ নেই। তারা যে পরাজিত হচ্ছে তা নিয়ে আর সামান্যতম সন্দেহও নেই। তার কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কোথাও আরেক ভিয়েতনামের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় সেটি আফগানিস্তান। সমগ্র বিশ্বের লড়াকু জিহাদীদের জন্য বড় কাঙ্খিত স্থানটি এখন আর ইরাক নয়, সেটি আফগানিস্তান। ন্যাটোর পরাজয়ের সে সুর ধ্বনিত হয়েছে ব্রিটেনের ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার প্রখ্যাত কলামিস্ট রবার্ট ফিস্কের লেখাতেও। ২০০১ সালের অক্টোবরে মার্কিন বাহিনী দেশটিকে দখলে নিলেও শুরুতেই তারা বুঝতে পারে দেশটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশটি নিয়ন্ত্রণের দায়ভার চাপায় ন্যাটোর উপর। ফলে হাজির করে প্রায় ৪০টি দেশের বহুজাতিক ৭০ হাজার সৈন্যকে। এখন দাবী উঠছে, আরো সৈন্য চাই। বাড়তি সৈন্য সংখ্যা বিজয়ের সম্ভাবনা কি আদৌ বাড়াবে? পুকুরে মাছের সংখ্যা বাড়লে যেমন শিকারীর মৎস্য শিকারে সুবিধা হয় তেমনি সুবিধা হবে তালেবানদের। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা মি. ব্রেজেনিস্কি বলেছেন, আফগানিস্তানে সৈন্য বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এতে আফগানদের ক্রোধ বাড়বে।

হতাশা ফুটে উঠছে এমনকি আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর কমান্ডারের সাম্প্রতিক বক্তব্যেও। তিনি বলেছেন, মোজাহিদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস ও পাক-আফগান সীমান্ত দিয়ে তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে না পারলে বিজয় অসম্ভব। মোজাহিদদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র বলতে তিনি বুঝিয়েছেন পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে। কিন্তু সেটি কি সম্ভব? সেটি সম্ভব নয় বলেই নিশ্চিত বলা যায়, আফগানিস্তানে তাদের বিজয়ও অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ সীমান্তে বিশাল উঁচু দেওয়াল ও বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দিয়েও প্রতিবেশী মেক্সিকো থেকে বেআইনী অনুপ্রবেশকারিদের প্রবেশ এক দিনের জন্যও রুখতে পারেনি। যে মানুষ আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করতে পারে তারা কি একটি দেশের সীমান্তও অতিক্রম করতে পারে না? প্রতিবছর হাজার হাজার মেক্সিকান প্রবেশ করছে যুক্তরাষ্ট্রে। আর পাক-আফগান সীমান্ত সমভূমি নয়, সমুদ্র-ঘেরাও নয়, বরং দুর্গম পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্গলে ঘেরা। ফলে এ সীমান্ত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। বহু হাজার মাইল বিস্তৃত পাহাড় পর্বতের কোন কোনা দিয়ে কে কিভাবে প্রবেশ করছে সেটি কয়েক লক্ষ সীমান্ত প্রহরী দিয়েও কি রুখা সম্ভব? সেটি দখলদার রুশ বাহিনী পারেনি। ভারত শাসনকালে ব্রিটিশরাও পারেনি। ন্যাটো বাহিনীও পারছে না। অথচ ন্যাটো সে পাহারাদারির দায়িত্ব চাপাচ্ছে পাকিস্তানের উপর। পাকিস্তানের সে অর্থবল, লোকবল, মনবল - কোনটাই নেই। ভারতের সাথে তার নিজের সীমান্ত পাহারা দিতেই পাকিস্তান হিমসিম খাচ্ছে। সম্প্রতি কাশ্মীর অশান্ত হওয়ায় তার দুশ্চিন্তা আরো বেড়েছে। ফলে তারা কেন নিজ খরচে আফগান সীমান্ত পাহারা দিবে? এটি তো আফগান সরকার ও মার্কিনীদের কাজ। মার্কিনীদের চাপে তাদের অনুগত বন্ধু জেনারেল মোশাররফ তবুও বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। অথচ মোশাররফের সে ব্যর্থতা মার্কিন প্রশাসন মেনে নিতে পারেনি, বলছে মোশাররফ একাজে আন্তরিক ছিল না। এখন তালেবানদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য দোষ চাপিয়েছে পাকিস্তানের সরকার ও তাদের গোয়েন্দা সংগঠন আইএসআইয়ের উপর। শেষদিকে বুশ প্রশাসনের ক্ষোভ এতটাই বেড়েছিল যে মোশাররফের অপসারণেও সায় দিয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নিজেরাই বহুবার বোমা বর্ষণ করছে এবং বহু নিরপরাধ নিরীহ মানুষকে তালেবান বলে হত্যা করছে। আর এভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিকে আরো অস্থিতিশীল করছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মার্কিন বোমা বর্ষণে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব যেভাবে লংঘিত হলো সেটি পাকিস্তানের যে কোন সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। এতে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়েছে মার্কিনীদের পক্ষ নেওয়া। এতে তালেবান বাহিনীর রিক্রুটমেন্ট ও সমর্থণ বেড়েছে প্রচণ্ড ভাবে, এবং সেটি বুঝা যাচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের রণক্ষেত্রে। তালেবানরা যে শুধু আফগানিস্তানের ৭০% দখলে

নিয়েছে তাই নয়, পাকিস্তানেরও সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের বিশাল পাহাড়ী এলাকাও নিজ দখলে নিয়েছে। পাকিস্তানের পুলিশ বা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রবেশ সেখানে অসম্ভব। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকেও যেতে হয় হেলিকপ্টার গানশিপ ও ভারি কামান নিয়ে। সেটিও কয়েক দিনের দখল জমিয়ে রাখার জন্য।

ন্যাটোর ব্যর্থতা প্রকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে চলতি সপ্তাহে। দেশের গ্রামীন এলাকা যে হাতছাড়া হয়ে গেছে তা নিয়ে এমনকি বুশ-ব্রাউন-সারকোযী চক্রেরও দ্বিমত নেই। এমনকি ঔপনিবেশিক চেতনার ধারক ব্রিটেনের ডেইলী টেলিগ্রাফও তা নিয়ে দ্বিমত করেনি। তবে তাদের বিশ্বাস ছিল, সমগ্র আফগানিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও অন্ততঃ কাবুল ও তার আশেপাশের এলাকার উপর ন্যাটো নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এ সপ্তাহে প্রমাণ হল, কাবুলের অতি কাছেও তারা কতটা নিরাপত্তাহীন। পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম ছবি ছেপেছে, মোটর সাইকেলে, খোলা জিপে চেপে মোজাহিদগণ কিভাবে কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়ে - যা পাকিস্তানে সীমান্তের দিকে যাওয়ার প্রধান সড়ক - তার আশেপাশে প্রকাশ্যে চলাফেরা করে। গত ১৭/০৮/০৮ তারিখে কাবুল থেকে সামান্য দূরে ফ্রান্সের ১০ জন সৈনিককে তারা হত্যা করেছে এবং মারাত্মক ভাবে আহত করেছে ২১ জনকে। পরদিকে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে বিশাল মার্কিন ঘাঁটি ক্যাম্প সালেমোর সম্মুখ ভাগে হামলা হয়েছে। নিহত হয়েছে ১৩ জন যারা মার্কিনীদের জন্য করতো, আহত হয়েছে আরো ২২ জন। গত ৭ই জুলাই বিধ্বস্ত হয়েছে কাবুলের ভারতীয় দূতাবাস। সে বোমা হামলায় মারা যায় ৪১জন।

তবে যতই বাড়ছে প্রতিরোধ ততই মারমুখী হচ্ছে ন্যাটো বাহিনী। গত ২০/০৮/০৮ তারিখে মার্কিন বাহিনী হিরাত প্রদেশের সিনদান্দ জেলাতে ৭৬ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে ১৯ জন মহিলা এবং ৫০ জন শিশু। আর এ তথ্য প্রকাশ করেছে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র দফতর। তবে আল-জাজিরা স্থানীয় ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে খবর দিয়েছে, এ হামলায় মারা গেছে ১০০ জনেরও বেশী। এখন আর শুধু তদন্ত নয়, তারা দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করছে। এর ক'দিন আগে ১১ই আগষ্ট মার্কিন বিমান হামলায় নিহত হয়েছে ১২ জন বেসামরিক নাগরিক। একমাত্র গত ৮ মাসেই তারা ১ হাজারের বেশী বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। কথা হলো, এমন হত্যা পাগল মার্কিনীরা আফগানিস্তানকে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন উপহার দিবে সেটি কি কেউ বিশ্বাস করবে? অন্ততঃ আফগানরা সেটি আর বিশ্বাস করে না বলেই এখন তারা তাদের থেকেই তারা মুক্তি চায়। আফগানদের কাছে জীবন বাঁচানই এখন বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলা হয়ে থাকে, নিউয়র্ক ও পেন্টাগণে ২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর যে হামলা হয়েছিল আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পরিকল্পনা হয়েছিল তারপর। কথাটি ঠিক নয়। পরিকল্পনা হয়েছিল নব্বইয়ের দশকেই। একথা সত্য, সোভিয়েতে রাশিয়ার লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোজাহিদদের সাহায্য করেছিল। তবে সে সাহায্য নিঃশর্ত ছিল না। তাদের আশা ছিল সোভিয়েতে রাশিয়ার পরাজয়ের পর আফগানিস্তান তাদের অনুগত থাকবে। কিন্তু তালেবানদের ক্ষমতায় যাওয়ায় মার্কিনীদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। আর এ কারণে তাদের অপসারণও মার্কিনীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেটি নিউয়র্কে হামলার বহু পূর্বেই। সেটি কোন গোপন বিষয়ও ছিল না। নিউজ উইক ও ওয়াশিংটন পোষ্টে তা নিয়ে একাধিক নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। ওয়াশিংটন পোষ্টের প্রথম পৃষ্টায় ছাপা হয়, সিআইএ সেখানে ১৯৯৭ সাল থেকে তালেবান সরকার উচ্ছেদের লক্ষ্যে কাজ করছিল। ২০০১ সানের ৩রা অক্টোবের ওয়াশিংটন পোষ্ট খবর ছাপে, ক্লিনটন প্রশাসন এবং প্যাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ১৯৯৯ সালেই বিন লাদেনকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। তার আগেই জেনারেল মোশাররফ নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করেন। জেনারেল মোশাররফ আর সে পরিকল্পনা নিয়ে এগুয়নি। ইংল্যান্ডে থেকে প্রকাশিত জেনেস ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও রাশিয়ার সহযোগিতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তালেবান সরকারের অপসারণের চেষ্টা করে। এ লক্ষ্য পূরণে যুক্তরাষ্ট্র তাজাকিস্তান ও উযবেকিস্তানে অবস্থিত তাদের ঘাঁটি থেকে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে বিপুল অস্ত্র জোগাতে থাকে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ২০০০ সালের ২রা নভেম্বের খবর দেয়, তালেবান সরকার হটানোর লক্ষ্যে সিআইএ বেছে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা রবার্ট ম্যাকফারলেনকে। তিনি তালিবান বিরোধী সাবেক মোজাহিদ নেতা আব্দুল হক ও আহম্মদ শাহ মাসুদকে বেছে নেন এবং সে পরিকল্পনা হয়েছিল টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার অনেকে

আগেই। কিন্তু মার্কিনীদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কারণ, এ দুইজনই নিহত হয় তালেবান সরকারের হাতে। আহমেদ শাহকে হত্যা করতে সাহায্য করেছিল একজন আলজেরিয়ান মোজাহিদ।

অন্যদের ঘাড়ে অস্ত্র রেখে উদ্দেশ্য সাধনই মার্কিনীদের প্রথম প্রায়োরিটি। লক্ষ্য, নিজেদের অর্থ ও রক্তক্ষয় কমানো। কিন্তু তালেবানদের বিরুদ্ধে সে কৌশল সফল হয়নি। ফলে নিজেদেরই নামতে হয়েছে। এবং সেটির শুরু ২০০১ সালের ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগণ বিধ্বস্ত হওয়ার ১ মাস পর। শুরুতেই ঘোষণা দিয়েছিল, হামলার লক্ষ্য আল-কায়েদা নেতা বিন লাদেন ও তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের গ্রেফতার এবং আল কায়েদাকে ধ্বংস করা। কিন্তু বিগত প্রায় ৭ বছরে সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এখন তাদেরকে গ্রেফতার বা হত্যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বোমা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবিস্কারককে হত্যা করে লাভ হয় না। তবে ন্যাটো বাহিনী সফল হয়েছে কয়েক লক্ষ নিরপরাধ মানুষ হত্যায়। হাজার হাজার বোমা ফেলেছে বসত গৃহে, হাটবাজারে এমনকি বিবাহ মজলিসে। সমগ্র দেশ পরিণত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। ৭ বছর লাগাতর যুদ্ধের পরও ন্যাটো বাহিনী দেশটির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে পারেনি। বরং কমেছে অনেক। ২০০১ সালে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, ২০০৮ সালে তা নাই। শুধু বেড়িয়েছে কবর, ধ্বংসস্তুপ ও পঙ্গু মানুষের সংখ্যা। কবরে কবরে ভরে উঠছে গোরস্থানগুলো। এগুলো পরিণত হয়েছে ন্যাটো-বর্বরতার প্রতীক। ৭ বছর আগে যে নিরাপত্তা পেত এখন সে নিরাপত্তার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন কি রাজধানী কাবুলেও নয়।

তালেবানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির কারণ জনসমর্থন। মাছ যেমন পানিতে ইচ্ছামত সাঁতার কাটে মোজাহিদরাও তেমনি জনসমর্থনের কারণে অস্ত্র কাঁধে রাস্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। ফলে তালেবান ধবংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্র জনগণকে। আফগানিস্তানে মত মুসলিম দেশে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেতে হলে যে কোন লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামী হতে হয়। তখন সে যুদ্ধে সাধারণ মুসলমান শুধু মৌখিক সমর্থণই দেয় না; অর্থ, সময় এবং রক্তও দেয়। রুশদের বিরুদ্ধে সেটিই প্রমানিত হয়েছে। এখন আবার সেটিই দ্বিতীয়বার প্রমানিত হচ্ছে। ইসলামে নিছক যুদ্ধ বলে কোন প্রতিশব্দ নাই। যেটি আছে সেটি হলো জ্বিহাদ। মুসলমানের প্রতিটি কর্মকে যেমন হালাল হতে হয়, তেমনি প্রতিটি যুদ্ধকে জ্বিহাদ হতে হয়। সেক্যুলার বা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে প্রাণদান দূরে থাক সামান্য অর্থদানেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আগ্রহ থাকে না। এটি অপচয়। এমন যুদ্ধে যোগ দেয় নিছক পেশাদার বেতনভোগী ও ধর্মে অঙ্গীকারশূণ্য সেক্যুলারেরা। কিন্তু জ্বিহাদ সর্ব-মুসলমানের। ধর্মপ্রাণ মুসলমান তখন দিগ্বিদিক থেকে ছুটে আসে পঙ্গপালের মত। তারা যোগ দেয় নিজ-খরচে। রুশ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানের জ্বিহাদে মোজাহিদরা ছুটে এসেছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলি থেকে। আফগানিস্তানে আজও সেটিই হচ্ছে। কারণ মুসলিম বিশ্বে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা কম নয় যারা নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাতের পাশাপাশি ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত জ্বিহাদের বিশুদ্ধ ক্ষেত্রেও খুঁজে। এমন ক্ষেত্রের পেলে তারা নিজ উদ্যোগে উড়ে আসে। ভৌগলিক বাধা কোন বাধাই নয়। এজন্যই তালেবান বাহিনীতে লড়াকু মোজাহিদের অভাব হচ্ছে না। রুশ বাহিনীর দখলদারির আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ন্যাটো বাহিনী সমস্যা হল তারা ইসলামের অতি মৌলিক বিষয়কেও বুঝতে ভূল করছে। একটি মুসলিম দেশে অমুসলিম দখলদারি এবং গণহত্যা যে জ্বিহাদের বিশুদ্ধ বৈধতা দেয় সে সামান্য জ্ঞান কি মার্কিনীদের আছে? এ অজ্ঞতার কারণে বুঝতেই পারে না, আফগানিস্তানের জ্বিহাদে কেন আরব, পাকিস্তানী, চেচেন, উজবেক বা উইগুর চাইনিজ মোজাহিদ লড়ছে। ভাবছে, সন্ত্রাসী বলে গালিগালাজ করলে বা গোয়ান্তেনামো বে'র ভয় দেখালেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভূলে যায়, ৪০টিরও বেশী অমুসলিম দেশের ৭০ হাজার সৈন্য ন্যাটোর পতাকা তলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে আফগানিস্তানে। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের। এসেছে অন্য গোলার্ধ ও বিশ্বের অন্য কোণ থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভূগোল কোন বাধাই সৃষ্টি করছে না। এমন প্যান-পাশ্চাত্যবাদ হলো তাদের রাজনীতি, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি। এর র্আও গভীরে রয়েছে তাদের প্যান-খৃষ্টবাদ। অথচ তারা ভূলে যায়, তাদের এ প্যান-পাশ্চাত্যবাদ, প্যান-খৃষ্টবাদ ও তার প্রতীক ন্যাটোর মোকাবেলায় আফগানিস্তানে যেটি প্রবল কাজ করছে সেটি হলো প্যান-ইসলামিজম। ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধে উঠে যে প্রতিরোধ লড়াই তারা লড়ছে সেটি তাদের নিছক রাজনীতি নয়, পররাষ্ট্রনীতি নয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটি সর্বোচ্চ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।

Written by ফরিদে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অর্থনৈতিক। মধ্য এশিয়ার তেল ও গ্যাসের খনিতে যাওয়ার জন্য তাদের রাস্তা দরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার নব্য আবিস্কৃত তেল ও গ্যাস খনির প্রায় ৭৫% এখন মার্কিনীদের হাতে। স্থলভূমি দিয়ে বারা পরিবেষ্টিত এ এলাকার তেল ও গ্যাস নিয়ে আসার জন্য আফগানিস্তানের উপর দিয়ে তারা তেল ও গ্যাসের পাইপ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তালেবানদের ক্ষমতায় থাকার কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ভিন্নতর। সোভিয়েত রাশিয়ার দখলদারমুক্ত করতে গিয়ে সমগ্র আফগানিস্তান পরিণত হয়েছিল জ্বিহাদের ইনস্টিটিউশনে। সে ইনস্টিটিউশন পরিচর্যা দিচ্ছিল জ্বিহাদী চেতনার। ইসলামের বিপ্লবী আদর্শ যে কত শক্তিশালী সেটির প্রমাণ তারা ময়দানে দিচ্ছিল। ইসলামকে দ্রুত একটি আদর্শিক শক্তি হিসাবে খাঁড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদিনা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের বুকে আর কোন দেশে এত মোজাহিদ ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কোন ভৌগলিক সীমারেখাও ছিল না। নানা ভাষাভাষি মানুষ এখানে এক মোহনায় এসে উপনীত হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চেচনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টার্গেট রূপে বেছে নিয়েছিল মার্কিন আধিপত্যবাদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তালেবানদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যের স্বার্থ ও মূল্যবোধের প্রতি এটিকে তারা হুমকি রূপে মনে করে। মুসলিম দেশগুলিতে ব্যভিচারে প্রাণদন্ড মিলবে, মদ্যপানে শাস্তি হবে, নিষিদ্ধ হবে নাচগান, উলঙ্গতা, বেআইনী হবে সূদী শোষণ ও কায়কারবার - এমনটি তাদের কাছে গ্রহনযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলোই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শিকড়। সাম্রাজ্যের বিস্তার না হোক, অন্ততঃ এগুলিকে তারা বিশ্বময় করতে চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব ছোট হয়ে যায়। তারা চায়, বিশ্বকে অভিন্ন মানচিত্রের আওতায় আনতে না পারলেও একটি অভিন্ন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আওতায় আনা। তাছাড়া তাদের বিচরণও বিশ্বময়। তারা যেখানে যায় মদ্যপান, ব্যভিচার, সূদখোরীর ন্যায় অভ্যাসগুলো সাথে নিয়েই যায়। বিশ্বের ৫৫টিরও বেশী মুসলিম দেশে সেগুলি নিষিদ্ধ হলে তাদের বাঁচাটাই নিরানন্দ হবে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এভাবে বিশ্বময় প্রচার করার প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করছিল তালেবানরা। শুধু আফগানিস্তানেই নয়, অন্যান্য মুসলিম দেশেও। তালেবানদের উচ্ছেদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কাছে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেটি গোপন বিষয়ও ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার বলেছিলেন, এটি হলো দুটি মূল্যবোধের যুদ্ধ, এবং ন্যাটো লড়ছে সে মূল্যবোধের বিজয়ে। একই যুক্তিতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বারাক ওবামা বলছেন, পাশ্চাত্যের মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্রাউন বলছেন, আফগানিস্তান হলো আসল ফ্রন্টলাইন। একই মত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও জার্মান চ্যান্সেলরেরও। এভাবে এ যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একার যুদ্ধ থাকেনি। পরিণত হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য খৃষ্টান জগতের যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জায়েজ করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের মুখ দিয়ে একবার ক্রসেড শব্দটিও বেরিয়েছিল। তাই যুদ্ধের শুরুতে বিন লাদেনকে হত্যা করা প্রায়োরিটি বলে ঘোষণা করা হলেও আজ আর সেটি মুখে আনা হয় না। এখন সেটি শরিয়তি আইনের উচ্ছেদ, জ্বিহাদী ইসলামের বিনাশ। তালেবানদের অপরাধ শুধু এ নয় যে তারা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করেছিল। এবং জিহাদকে বিশ্বময় করছিল।

এজন্যই ন্যাটোর যুদ্ধ শুধু সামরিক নয়; আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোকে মৌলবাদ বলে সেগুলোরই বিলুপ্তি চায়। ফলে তারা শুধু বোমারু বিমান, ট্যাংক ও গোলাবারুদ নিয়েই সেখানে হাজির হয়নি, হাজির হয়েছে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম, সেক্যুলার মডেলের স্কুল, মদ, অশ্লিল ভারতীয় ও হলিউডের ছায়াছবি ও অসংখ্য সেক্যুলার এনজিও নিয়েও। এনজিওগুলো বাংলাদেশের মহিলাদের যেমন রাস্তায় নামিয়েছে এবং লোন দেওয়ার নামে সূদ খাওয়ার ন্যায় অতি জঘন্য হারাম কাজকে সংস্কৃতি বানিয়ে ফেলেছে সেটি তারা আফগানিস্তানেও করতে চায়। ইসলাম এমনকি হজ্বের ন্যায় ফরয কাজেও মহিলাদের একাকী যেতে দেয় না। অথচ এনজিওগুলি মহিলাদের একাকী গাছ পাহারায় নামিয়েছে, দোকানে বসিয়েছে। যে মূল্যবোধের কারণে ঢাকা বা মুম্বাইয়ে পতিতাবৃত্তি বা ব্যাভিচার যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয় বরং আইনসিদ্ধ একটি পেশা, সেটি তারা আফগানিস্তানেও দেখতে চায়। আরো দশটি পণ্যের ন্যায় নারী দেহকেও সহজে কেনা-বেচার পণ্যে পরিণত করতে চায়। তাদের কাছে ব্যাভিচারিদের পাথর মেরে হত্যার কোরআনি আইন অমানবিক। তালেবানদের পরাজয়ের পর বিজয়ী শক্তি তাই ঘোষণা দিয়েছিল, তার যাই হোক শরিয়তের আইন তারা প্রতিষ্ঠিত করতে দেবে না। হামলার লক্ষ্য যে নিছক বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরের হত্যা নয় বরং ইসলামের বিধান ও মূল্যবোধের নির্মূল সেটিই সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল। তাদের কথা, ইসলামকে জিহাদমুক্ত করতে হবে। কারণ, এ জিহাদী চেতনাই পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারের পথে বড় বাধা। জিহাদী চেতনার শক্তি তারা স্বচক্ষে দেখেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। দেখেছে লেবাননে। যে ইসরাইলী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মিশর, সিরিয়া ও জর্দানের মিলিত বাহিনী এক সপ্তাহ টিকতে পারেনি সে ইসরাইলী বাহিনীকে তিন সপ্তাহব্যাপী রুখেছে

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

হিজবুল্লাহ। একই শক্তিবলে হামাস ইসরাইলীদের বিতাড়িত করছে গাজা থেকে। এ জ্বিহাদী চেতনা-সম্পন্ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ। মুসলমানেরা কোন ধরণের অস্ত্র বানাবে বা ব্যবহার করবে সেটি যেমন নির্ধারণ করতে চায় তেমনি ইসলামের কোন শিক্ষাকে গ্রহন করবে বা বর্জন করবে সেটিও তারা নির্ধারণ করে দিতে চায়। আফগানিস্তানে ন্যাটোর যুদ্ধ কোন জাতিয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নয়, কোন জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধেও নয়। বরং সেটি হলো ইসলাম ও ইসলামি মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। এখানেই তালেবানদের বড় সাফল্য। পিএলও সেটি পারেনি। কাশ্মিরীরাও এ যাবত পারেনি। (অবশ্য কাশ্মিরীরা ইদানিং জাতিয়তাবাদ ছেড়ে ইসলামের দিকে আসছে। তারা এখন শ্লোগান দিচ্ছে ‘আজাদীকা মতলব কিয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’) অথচ তালেবানরা এ যুদ্ধকে ইসলাম ও অনৈসলামের যুদ্ধে পরিণত করছে। পরিণত করছে সেক্যুলারিজম ও জাতিয়তাবাদমুক্ত এক নির্ভেজাল জ্বিহাদে। এমন যুদ্ধে মহান আল্লাহও তাদের পক্ষে হয়ে যান। নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিও হয়েছিল। তালেবানদের বিশ্বাস, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় তো এ পথেই সুনিশ্চিত হয়। কথা হলো, ন্যাটোর বিমানগুলো আফগানদের অসংখ্য বাড়ী-ঘর ও দোকানপাট গুড়িয়ে দিতে পারলেও এ বিশ্বাসকে তাক করে কি একটি গোলাও ছুড়তে পেরেছে? ২৩/০৮/০৮